ভালো আছ?

কপিল দেব

ভোরের আলোতে ধর্মনগরের দীঘির পাড়কে চমৎকার দেখায়, আর বিশেষকরে যখন তা শীতকাল। দিঘী ঘিরে থাকা রেলিংএর উপর যখন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খোয়াসায় জলবিন্দু জমে থাকে এবং এগুলোকে দেখে অনুভব করা যায় যে দীপাবলি ও কালিপূজোর বেশী দিন বাকি নেই, সেই অনুভূতিটি অসাধারন। নিজের দোতালা ফ্ল্যাটে থাকা জানালার পাশে দাড়িয়ে দিঘির দিকে চেয়ে শ্যমরেশবাবু এই কথাগুলো ভাবছিলেন। হঠাৎ একটি আওয়াজে ওনার চোখ বসার ঘরের জানালা থেকে সরে গিয়ে টেবিলে পরে থাকা ঐ জিনিসটার দিকে গেল। ওটি উনার মোবাইল, এবং ফোন আসলে ওটাতে এমনি আওয়াজ করে। আওয়াজ হচ্ছে উনার প্রিয় বন্ধুর চেঁচামেচি। উনি মোবাইলটা উঠিয়ে, নম্বরটা একবার দেখে- ''হ্যাঁ.... বল খোকা, আজ এত সকালে?'' ফোন তোলে শ্যমরেশবাবু বললেন। ''কেমন আছো বাবা? জ্বর কমেছে? কাল রাত থেকে তো সুস্থ নিশ্চই''? ফোনের ওপার থেকে গলা আসল, গলাটা হলো শ্যমরেশবাবুর ছেলে প্রিয়তোষের। ''হ্যাঁ... ভালো আছি, কাল রাত থেকে তো

অনেকটাই সুস্থ। কিন্তু মনে হচ্ছে আজ আমার সকালের পার্ক ভ্রমনটা আর হবেনা''- উত্তরে শ্বমরেশবাবু বললেন। ''আঃ বাবা, তোমাকে এতবার বলার পরেও তোমার সকালের বেরোনোটা কমাননি? এখন বুঝতে পারছি তোমার জ্বর হওয়ার কারন। এত সকালে কুয়াশায় বের হলে তো জ্বর হবেই। বাবা বোঝনা কেন! তুমি ওখানে একা তাই তোমার কিছু হলে আমরা চিন্তায় পড়ে যাই''- একটু বিরক্তের সহিত প্রিয়তোষ বলল। ''এর জন্যই তো, আমি এখানে একা, তাই ওরাই হচ্ছে আমার একমাত্র বন্ধু যাদের সঙ্গে থেকে আমার সময়গুলো কেটে যায়'' একটু দুঃখের সহিত শ্বমরেশবাবু বললেন। '' আচ্ছা ছাড় ঐসব কথা, বল্ তোদের আসার টিকিট করা হয়েছে? ভুলিসনা দীপাবলির আর একমাস বাকি। কালই গিয়ে তোদের তিনজনের টিকিট করে নিস খোকা। ওহ্ঃ আমি তো ভুলেই গেছি, আজকাল তো তোরা কিসব ইন্টারনেট দিয়ে ঘরে বসেই টিকিট বুক করে ফেলিস'' হাসতে হাসতে শ্বমরেশবাবু কথাগুলো বললেন। ''বাবা''.... প্রিয়তোষের কথা থামিয়ে শ্বমরেশবাবু বলে উঠলেন ' জানিস নাতিটাকে দেখার জন্য আমার মনটা কেমন করছে। কেমন আছে ঐ দুষ্টুটা? হ্যা বল, খোকা....।' শ্বমরেশ বাবু বলেলেন। 'হ্যা... পিজু ভালোই আছে, বাবা আমি বলছিলাম কি, এবার হয়তো আমাদের আসা হবেনা' প্রিয়তোষ একটু নরম গলায় বলল। কথাটি শুনে শ্বমরেশবাবু কিছুক্ষনের জন্য চুপ হয়ে গেলেন। প্রিয়তোষ আরও বলল 'ছুটি পাইনি বাবা'। কিছুক্ষন পর শ্বমরেশবাবু বললেন ' ভেবেছি এবার হয়তো পিজুকে দেখব, সেই তিন বছর হয়েছে.....' হতাশ হয়ে শ্বমরেশবাবু বললেন। 'মন খারাপ করোনা বাবা। আসলে বিষয়টা হল আমরা কয়েকদিন আগে গোয়াতে ছুটি কাটিয়ে এসেছি, তাই এখনের ছুটিটা পাইনি। কিন্তু তুমি চিন্তা করোনা, আমি কয়েকদিন পর ছুটি নেওয়ার চেষ্টা করবো, পিজুর পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর আমি ছুটির দরখাস্ত দেব'। 'কিন্তু তাতে তো আরও আনেক দিন বাকি, সেই পাঁচ মাস'। 'চিন্তা করোনা বাবা পাঁচ মাস দেখতে দেখতেই কেটে যাবে'। 'কিন্তু তুই তো এখন না গেলেই পারতিস খোকা'।'কি করবো বাবা, পিজুর স্কুলের ছুটিতে ওর বন্ধুরা নাকি ঘুরতে গিয়েছে, তো উনি বায়না ধরলেন এখন ওনাকেও কোথাও ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হোক। আমি ভাবলাম যে গোয়াতে চলে যাই, তোমার বউমারও গোয়া দেখা হবে এবং পিজুরও ঘোরা হয়ে যাবে। তাই আরকি.....'।'কিন্তু খোকা.....' প্রিয়তোষ ওর বাবাকে থামিয়ে দিয়ে বলল- 'বাবা আমার কিছুক্ষনের মধ্যে অফিস যাওয়ার জন্য তৈরী হতে হবে, আমি না হয় বিকালে কল করবো'। বলে প্রিয়তোষ ফোনটা রেখে দিল। শ্বমরেশবাবু ফোনটা আবার টেবিলে রেখে, জানালার কাছে গিয়ে হতাস চোখে জানালার বাইরের দিকে চেয়ে থাকলেন।

শ্বমরেশবাবুর এক ছেলে এক মেয়ে। অনেক কষ্টকরে পড়িয়েছেন ছেলেমেয়েকে, কারন উনি ছিলেন একটি অফিসের কেরানী, সামান্য টাকা ছিল মাইনে। ছেলে মেয়ে দুজন উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। ওরা দুজন বাইরেই থাকে এবং নিজের পছন্দের মানুষকে বিয়ে করে নেয়। শ্বমরেশবাবুর আবার এতে আপত্তি ছিলনা। ওদের বাইরে থাকার ফলে, শ্বমরেশবাবুকে একাই থাকতে হয়। ওরা দুজনই পরপর চেষ্টা করে ওনাকে ওদের ওখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু উনি যেতে চাইলেন না। কারন উনি উনার জন্মভূমি ধর্মনগরকে ছেড়ে কোথাও যেতে রাজী নন। প্রতিবছর শ্বমরেশবাবুর ছেলে মেয়ে ওদের পরিবারকে নিয়ে একবার করে ওনাকে দেখতে আসে। কিন্তু গত দুবছর ধরে বিভিন্ন অসুবিধায় ওদের আসা হচ্ছেনা। যোগাযোগের মাধ্যম শুধু ফোন। শ্বমরেশবাবুর আবার একা থাকতে কোনো দুঃখ নেই। উনি দিব্যি আছেন। উনার ঘরের যাবতীয় কাজ করার জন্য একটি লোক রাখা আছে এবং বই পড়ে, টিভি দেখে উনার সময় ভালোই কেটে যাচ্ছে। কিন্তু সময় কাটানোর প্রধান উৎস হল উনার প্রতিদিন সকালে পার্কে পায়চারি করা। সকালের বেশিরভাগ সময় উনি পার্কে কাটান, কারন ওখানে রয়েছে ওনার প্রিয় বন্ধুরা। না মানুষ বন্ধু নয়। পার্কের একটি বিশেষ জায়গায়, যা একটি বট গাছের তলা। ওখানেই প্রতিদিন উনার বন্ধুদের সাথে দেখা করেন। এই বিশেষ জায়গাটা আবার শ্বমরেশবাবুই আবিষ্কার করা কারন পার্কের ওইদিকে, যেদিকে ওই বটগাছটি অবস্থিত ঐদিকে মানুষ কমই আসাযাওয়া করে শ্বমরেশবাবু ছাড়া। শ্বমরেশবাবুই প্রথম ওই জায়গায় এসে বসেছিলেন এবং ওখানেই ওনার বন্ধুদের সাথে প্রথম পরিচয়। এখন শ্বমরেশবাবুর ফলে সবাই জানতে পেরেছে যে পার্কের এটাও একটি জায়গা যেখানে বসে সময় কাটানো যায়। পার্কে সচরাচর যারা আসাযাওয়া করেন ওরা জানেন যে ওটা শ্বমরেশবাবুর আবিষ্কৃত জায়গা, এবং শ্বমরেশবাবুর বন্ধুদেরও এখানে পাওয়া যায়। শ্বমরেশবাবুর বন্ধুরা আবার খুব কমই শ্বমরেশবাবু ছাড়া অন্যদের সাথে মেশে, একথা আবার সবাই জানে। শ্বমরেশবাবু এদের সঙ্গেই নিজের জীবনের সুখ দুঃখের কথা বলে থাকেন। প্রতিদিন সকালে উনি উনার বন্ধুদের জন্য খাবার নিয়ে পার্কের বটের তলায় বসেন এবং একটি নির্দিষ্ট সময় ওরা আসে, শ্বমরেশবাবু

ওদেরকে ওদের খাবার দেন এবং ওদের সাথে গল্প করতে থাকেন। শুধু শ্যমরেশবাবুই যেন ওদের ভাষা বোঝেন। শ্যমরেশবাবু বলেন ওরাও নাকি সুখ, দুঃখের কথা ওনার সাথে বলে থাকে।শ্যমরেশবাবু একা জীবনে ওরাই যেন হয়ে উঠেছে বেঁচে থাকার প্রধান উৎস।

শ্যমরেশবাবু যেমন ওনার ছেলে মেয়েকে ভালোবাসেন, তেমনি ওই বন্ধুরাও শ্যমরেশবাবুর জীবনের এক বিশেষ অঙ্গ।

শ্যমরেশবাবু ঘড়ির দিকে তাকালেন, তখন সময় ৬টা বেজে ৫ মিনিট। অন্যদিন এই সময়ে উনি পার্কে যাওয়ার জন্য তৈরী হতে থাকেন। কিন্তু আজ ওনার পার্কে যাওয়া হবেনা। ওনার বন্ধুরা হয়তো পথ চেয়ে বসে থাকবে। একথা ভাবতে ভাবতে উনি উনার শোয়ার ঘরে গিয়ে জানালার দিকে তাকালেন। কারন শোয়ার ঘরের জানালা দিয়ে ভালোকরে তাকালে পার্কের সেই বটের তলাটা দেখা যায়। কিন্তু কুয়াশায় উনি কিছু দেখলেন না। ফলে উনার তাকানো বৃথা বলে উনি কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। শ্যমরেশবাবুর মনে অনেক আশা ছিল যে এবার হয়তো উনি দীপাবলি উনার নাতি পিযোষের সঙ্গে কাটাবেন, কিন্তু তা আর হল না। এবারের দীপাবলিও ওনার একা কাটাতে হবে এই কথা ভেবে মনটা বেদনায় ভরে উঠল। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ করে উনার কানে একটি আওয়াজ আসল। প্রথমত শ্যমরেশবাবুর আওয়াজটিকে গ্রাহ্য করলেন না। উনি উনার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকলেন। কিন্তু ধিরে ধিরে যখন আওয়াজটি প্রবল হয়ে আসল তখন উনি চেষ্টা করলেন আওয়াজটি কোথা থেকে আসছে তা বোঝার। কিন্তু উনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। ফলে উনি সেই আওয়াজের উৎস খোঁজার জন্য উনার রান্নার ঘর থেকে বের হয়ে উনার বসার ঘরের দিকে এগোলেন। শ্যমরেশবাবু বসার ঘরে প্রবেশ করে একবার চারিদিকে তাকালেন এবং উনি বুঝতে পারলেন যে আওয়াজটা বসার ঘর থেকে আসছে না। তাই উনি বসার ঘর থেকে বের হয়ে উনার শোয়ার ঘরের দিকে যেতে শুরু করলেন। উনি যতই শোয়ার ঘরের দিকে এগুতে লাগলেন আওয়াজটা ততি স্পষ্ট হয়ে উঠল উনার কানে। উনি এক পা এক পা করে শুয়ার ঘরের দিকে এগুতে লাগলেন। অবশেষে উনি শোয়ার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন এবং প্রবেশ করে যা দেখলেন তাতে তিনি হতভম্ব।

শ্যমরেশবাবু উনার শোয়ার ঘরের জানালাটা ভুলবসত খোলা রেখে দিয়েছিলেন এবং আওয়াজটার উৎস খোজতে উনি যখন শোয়ার ঘরে প্রবেশ করলেন তখন উনি দেখলেন যে উনার ঘরের সে খোলা জানালা দিয়ে ঝাঁকেঝাঁকে পাখি প্রবেশ করেছে। উনি অবাক চোখে পুরো ঘরের দিকে একবার তাকালেন এবং দেখলেন যে ঘরের প্রতিটি জায়গায় পাখি আর পাখি। শ্যমরেশবাবু বুঝতে পারলেন, উনি যে আওয়াজটি খোজছিলেন সেটা আর কিছুই নয়, উনার প্রিয় বন্ধুদেরই ঘরে প্রবেশ করার আওয়াজ। উনার মনে অনেক প্রশ্ন জাগল। কেমন করেই বা জানতে পারল এটা যে শ্যমরেশবাবুর ঘর? এটা কি সম্ভব? শ্যমরেশবাবু এদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে এসব কথা ভাবতে থাকলেন। অবশেষে শ্যমরেশবাবুর মুখে একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল এবং উনি উনার সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজে পেলেন। উনি বুঝতে পারলেন যে ওনার প্রতি ওদের বন্ধুত্বের টান ও ভালবাসাই এদের এই পথ দেখিয়েছে। আর এরাও তো প্রানী। যেখানে প্রাণ সেখানে ভালবাসা, বন্ধুত্ব থাকবেই। শ্যমরেশবাবুর হঠাৎ যেন মন খুশীতে, আনন্দে ভরে উঠল। উনি দেরি না করে ওদের দিকে কিছু দানা ছড়িয়ে দিলেন। আর তখনই একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঘটল। কিছু সংখ্যক পাখি ছাড়া বাকি সব পাখিই সেই ছড়িয়ে দেওয়া দানার দিকে এগুলো না। শ্যমরেশবাবু বুঝতে পারলেন না কেন উনার প্রিয় বন্ধুরা আজ এমন আচরন করছে। অবশেষে তিনি যখন বিষয়টা বুঝতে পারলেন তখন তিনি হতভম্বের মতো ওদের দিকে চেয়ে রইলেন। শ্যমরেশবাবুর বন্ধুরা আজ খাবারের সন্ধানে আসেনি। এতদিন শ্যমরেশবাবু ওদেরকে যেভাবে স্নেহ করে এসেছেন আজ হয়তো ওরা সেই বন্ধুত্বের প্রতিদান দিতে এসেছে। আজ হয়তো ওরা শ্যমরেশবাবুকে নিরবে নিঃশব্দে জিজ্ঞাসা করতে এসেছে, ভালো আছ?